শংকরের অদ্বৈত মায়াবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

দ্বিবিধ অস্বীকার (Two Negations):

শ্রীঅরবিন্দের 'দর্শন'-এর সমগ্র কাঠামোটি যে মূল ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে তাহল 'আত্মা' এবং 'জড়' উভয়ই সত্য— এদের প্রকৃত সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়েই যথার্থ দার্শনিক উপলব্ধি সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ জানতেন 'জড়বাদ' এবং 'আধ্যাত্মবাদ', দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব এই জগতকে নিজের নিজের মতো ব্যাখ্যা করেছে এতদিন। জড়বাদীরা যেমন 'আত্মা'কে মনের কল্পনা বলে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করেছে, তেমনি আধ্যাত্মবাদীরাও আবার এই জড়-জগৎকে মিথ্যাস্বপ্ন ও কল্পনামাত্র বলে অবজ্ঞা করে এসেছে। সেদিক থেকে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন হল এই দুই এর সমন্বয়। 'দিব্যজীবন' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন: পৃথিবীতে দিব্য জীবনের উপলব্ধি ততক্ষণ সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি যে দেহের প্রাসাদের মধ্যেই চিরন্তন আধ্যাত্মশক্তির বাস। শ্রীঅরবিন্দের মতে, জড়বাদীদের কাজ সহজ। তারা আধ্যাত্মসত্তা অস্বীকার করে সহজেই ঘোষণা করে জড় এবং গতির অদ্বৈতবাদ, তবে এই জড়বাদী অদ্বৈতবাদ বেশি দিন কার্যকরী হয় না। কেননা জড়বাদীদের সমস্ত জ্ঞানের নির্ভরতা শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের উপর। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এলাকা এবং প্রয়োগ খুবই সীমিত। যেসব বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, তাদের থেকে তুলনামূলকভাবে যে সব বস্তুকে জানা যায়, সেগুলি অর্থহীন। আধুনিক জড়বাদীরা দাবি করেন যে, তাদের তত্ত্বের পেছনে বিজ্ঞানের সমর্থন আছে। জড়বাদকে বলা হয় অনিবার্যভাবেই বিজ্ঞান প্রকৃতি সম্পন্ন।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, বৈজ্ঞানিক সমর্থনও জড়বাদীদের আধ্যাত্মতত্ত্বের অস্বীকৃতিকে সমর্থন করে না। এমন কি আমাদের 'বুদ্ধি' যদিও জড়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য হয় না এবং সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে পরিণামে কম-বেশি 'তাত্ত্বিক গঠন' এ আশ্রয় নেয়—যা প্রকৃতপক্ষে জানার যোগ্যই নয়। এমনকি 'বিজ্ঞান' এর ওপর জড়বাদী দিক থেকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আরো মৌলিক বিষয়, 'বৈজ্ঞানিক আত্মা'(The scientific Spirit)কে উপেক্ষা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন উঠতেপারে, 'বৈজ্ঞানিক আত্মা' কি? এটা শ্রীঅরবিন্দের মতে, এটা এমন এক আত্মা, যে জানে না কোথায় থেমে থাকার স্থান, যে সম্ভবতঃ অচেতন আছে বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এবং যে প্রত্যেক সমস্যার সমাধান খোঁজে কেবল আর এক সামনের পদক্ষেপে

Scanned by CamScanner

- নতুন নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাই বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত নির্দেশ করে তার পেছনের দিকে। বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। তাই অ-জড়কে জড়ের অস্বীকার, প্রকৃতপক্ষে আত্ম-বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আধ্যাত্মিকতাবাদীদের জড়কে অস্বীকৃতিও সমভাবে একপেশে। প্রাসঙ্গিকভাবে 'দিব্যজীবন' গ্রন্থের (পৃ.১৬) তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : 'জড়বাদী যদি বলেন, জড়ই একমাত্র তত্ত্ব, প্রাতিভাসিক জগৎই একমাত্র বস্তু যার প্রামাণ্যকে মোটের উপর নিশ্চিত মনে করা চলে। এর পরেও যদি কিছু থাকে, সে আমাদের জানার বাইরে - সম্ভবতঃ তা অসৎ বা মনের বিকল্প অথবা বস্তু হতে অবচ্ছিন্নভাবের একটা খেয়াল শুধু। - তাহলে অধরার টানে বাউল সন্ন্যাসীও বলতে পারেন: শুদ্ধ চিৎ-ই একমাত্র তত্ত্ব - তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পরিণাম নাই। এই ব্যবহারিক জগৎ শুধু ইন্দ্রিয় ও মনের কল্পনা বা স্বপ্নবিলাস। (শুদ্ধবিদ্যার শাশ্বতদীপ্তি হতে পরাঙ্মুখ অবিদ্যাচিত্তের এ একটা বিকল্প মাত্র) ... এমনি করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হতে দুজনেই ভাবতে পারেন, তাঁর মতই সত্য।'

আধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসী দাবি করেন তাঁরা অতিন্দ্রিয় সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাঁরা মনে করেন, উচ্চ চেতনা কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হয় না কোন কিছুর দ্বারাই এবং তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের থেকে আরো সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে। শ্রী অরবিন্দ বলছেন, তাঁদের এই জ্ঞানই জড়জগতের সত্যতাকে অস্বীকার করতে প্রেরণা দেয়। আর এ জন্যই ভারতীয় যোগী এই 'জগৎ মিথ্যা' অথবা 'ব্রহ্মের মায়াবী রূপ' বলে মনে করেন।

কিন্তু এই যোগীদের দৃষ্টিতে একটি সহজ ঘটনা ধরা পড়েনি। যদি 'সত্য' আধ্যাত্মিক হয়, তবে জড়ের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা আছে। তাই জড়কে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও ভ্রমাত্মক। জড় এবং চিৎ- একই বিষয়ের দুটি দিক মাত্র। যদি জড় থেকে চিৎ এ উন্নীত হওয়া যায়, তবে অবশ্যই চিৎ থেকে জড়তে অবতরণ করা যায়। তাই জড়জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা হতে পারে না। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে বেদান্তে এই ভুল করা হয়েছে। বেদান্তে এই বোধ উপেক্ষিত হয়েছে যে, প্রত্যেক বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে বিজড়িত বা সংকোচন। তাই শ্রীঅরবিন্দ চেষ্টা করেছেন, তাঁর দর্শনে চিৎ ও জড় শক্তির সমন্বয়ের কথা বলেছেন — চিৎ এবং জড়কে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিয়েই।

সত্যতা — সচ্চিদানন্দ (Reality - Saccidananda):

শ্রীঅরবিন্দের অধিবিদ্যার মূল চালিকা শক্তি হল চিৎশক্তি। সত্যতাকে তিনি চরম আধ্যাত্মিকতা রূপে দেখলেও তার মধ্যে জড়কেও স্থাপন করেছেন। তাই তিনি 'দিব্য জীবন' গ্রন্থের (পৃ.২৩) চতুর্থ অধ্যায়ে বলছেন : 'শুদ্ধচিৎ তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ফোটাতে চায় আমাদের মধ্যে। আবার বিশ্বজড় হতে চায় আমাদেরই বিসৃষ্টির নিমিত্ত এবং আধার। দুটি দাবির কোনটিকেই উপেক্ষা করতে পারি না যখন, তখন সত্যের এমন একটা পরিপূর্ণ রূপ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখুঁত সমন্বয়। যার মিলনমন্ত্রে মানুষের জীবনে পায় তারা স্বাধিকারের মর্যাদা এবং তার চিন্তায় পায় যথাযোগ্য সমর্থক। কোথাও তাদের মূল্য ক্ষুণ্ণ হবে না, তাদের অন্তর্নিহিত সত্যের গৌরব কোথাও ম্লান হবেনা। স্বীকার করতে হবে, দুয়েরই মূলে আছে এক মর্ম সত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা।'

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মের বৈদান্তিক ধারণার এক অপেক্ষকৃত কম আলোচিত দিককে তুলে

Scanned by CamScanner

ধরেছেন তাঁর দর্শনে। তিনি অনুভব করেছিলেন বিশ্বচেতনায় চিৎ ও জড়ের একটি মিলনস্থল আছে। 'এইখানে এসে চিৎ এর কাছে জড় হয় বাস্তব, আবার জড়ের কাছে চিৎও হয় সত্য। কারণ বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত প্রাণ ও মনকে বলা যায় অখণ্ড সত্তার অন্তরিক্ষলোক - পরাপর তত্ত্বের মাঝে তারা যেন সেতু।'

এই বিশ্বচেতনার প্রবণতা অতিন্দ্রিয় চেতনার দিকে ধাবিত যা অজ্ঞেয়ের চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'এই অজ্ঞেয়'—যদিও জ্ঞানের অতীত, তবু তা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় এক চরম সুন্দরভাবে। এই সর্বত্র বিরাজমান সত্যতা, যাকে আমাদের সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় না, তাকেই বলা হয়ে থাকে ব্রহ্ম। এই সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মকে আমরা জানতে পারি না। প্রাথমিকভাবে কেবল একটা বিশ্বাস থাকে মাত্র এই সর্বত্র বিরাজিত সত্য সম্পর্কে।

এই সত্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য সচ্চিদানন্দ বা সৎ (Being) এর বিভিন্ন স্তর অথবা তন্ত্রীগুলিকে জানা প্রয়োজন—যেভাবে তাদের উপলব্ধি করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তবে মনে রাখা প্রয়োজন তিনি সৎ এর বিভিন্ন স্তর এর কথা বললেও 'সত্যতার প্রকৃতিতে বহু' একথা বলেন নি। তাঁর মতে, সত্যতা আবশ্যকীয় ভাবেই এক কিন্তু সৃষ্টি নির্ভর করে দ্বিমুখী তত্ত্বের ওপর, তাহল একত্ব এবং বহুতা। সৃষ্টি হল সত্যতার একত্বের আবশ্যকীয় প্রকাশ।

শ্রী অরবিন্দ এ প্রসঙ্গে আটটি তত্ত্বের কথা বললেন। এগুলি হল শুদ্ধ সত্তা, চিৎশক্তি, পরম সুখ, অতিমানস, মানস, মন (Psyche), জীবন ও জড়। প্রথম চারটি উচ্চ গোলার্দ্ধে এবং শেষ চারটি নিম্ন গোলার্দ্ধে অবস্থান করে। তিনি চরম সত্যতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, 'সচ্চিদানন্দ' বলে। অস্তিত্ব, চৈতন্য-শক্তি এবং পরম সুখ - এই তিন এর সম্মিলিত নামই সচ্চিদানন্দ।

শ্রী অরবিন্দের মতে, সচ্চিদানন্দই সকল কিছুর উৎস। তিনি নিশ্চেতনার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে স্বরূপে যাবার জন্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন। প্রাণ তারই চিৎশক্তির নিম্ন আংশিক প্রকাশ, মন তাঁরই সৃজনীশক্তি অতিমানসের প্রতিরূপ। সুতরাং সচ্চিদানন্দ হতেই যে জড়ের উৎপত্তি তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। দেহ, প্রাণ, মনকে ত্যাগ করে যে সার্থকতার সন্ধান করা হয়। তা চরম সার্থকতা নয়, এতে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় – সমস্যার সমাধান হয় না। দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, কিন্তু তা পরম সত্য হতে পারে না। এই সব দ্বন্দ্বের মিলনেই পরম সত্য।

এই সচ্চিদানন্দই নিজের সত্তাকে পদার্থ, শক্তিকে রূপ, চিৎকে আত্মপ্রকাশ, নিজের আনন্দ নিজের কাছে অর্ঘদান - এইভাবে নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করছেন। সচ্চিদানন্দ মানসিক স্তরে নিজের মানস চেতনায় জ্ঞান, ক্রিয়া ও আনন্দের বিষয় হবার জন্য বিষয়ের ভিত্তি হিসাবে নিজেকে জড় করেছেন।

ক) শুদ্ধ সত্তা (Pure Existence):

শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'শুদ্ধ সত্তা' হল সামান্য এবং অসীম শক্তির আধার'। তিনি বলছেন, যখন আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে জগৎকে দেখি আবেগমুক্ত কৌতূহল নিয়ে, তখন আমরা অনুভব করি আমাদের সামনে এক অসীম শক্তির আধারকে - যা তার অসীম কার্যধারাকে প্রকাশ করে থাকে সীমাহীন 'স্থান' এবং শাশ্বত 'কাল' এর মধ্য দিয়ে। এই 'শুদ্ধ সত্তা' আমাদের আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে অতিক্রম করে যায়, অথচ অজ্ঞতাবশতঃ আমরা মনে করি আমাদের চাহিদা ও স্বার্থপূরণের জন্যই এই বিপুল কর্মধারার অস্তিত্ব।

কিন্তু স্থিরভাবে বিবেচনা করলে আমাদের উপলব্ধি হবে যে, মানুষের ক্ষুদ্র কামনা-বাসনা

Scanned by CamScanner

পূরণের দিকে এর কোন লক্ষ্য নেই। নিজের বিশাল লক্ষ্য সাধনের জন্যই এর গতি নিজের টানে নিজে চলছে। তবে মানবজীবনের সঙ্গে যে এর কোনও সম্পর্ক নেই - এমন ভাবাও ভুল। যখন আমাদের উপলব্ধি হবে যে, এই অনন্ত শক্তির মানসোত্তর চেতনা অবিভক্ত হয়েও বৃহৎতম থেকে ক্ষুদ্রতম - সর্ববিষয়ে সমগ্রভাবে বিরাজিত, যখন আমরা বুঝব যে আমরা এই অনন্ত গতির এক অংশমাত্র, এই অনন্তকেই জেনে এর সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করা আমাদের প্রয়োজন, তখনই আমাদের প্রকৃত জীবনের সূচনা হবে।

এভাবে দার্শনিক অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে আমরা পেতে পারি শুদ্ধ সত্তার আভাস। এই সত্তা অসীম এবং অবাধ, 'স্থান' এবং 'কাল' এর দিক থেকে নয়, বরং এক্ষেত্রে 'স্থান' এবং 'কাল' এর প্রশ্নই ওঠে না। এই ধারণার একটি সুবিধা হল 'আমি' এবং 'অন্যরা' এই দ্বৈত ভাবনার থেকে উর্দ্ধে ওঠার চেতনা দেয় আমাদের এবং এই সত্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা প্রথম অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করি। এভাবে শুদ্ধ সত্তাকে দেখলে স্থান-কাল অদৃশ্য হয়ে যায়, আর স্থান-কাল অদৃশ্য হলে তাদের কারণে যে দ্বিত্ব তাও অদৃশ্য হয়।

শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন, এই 'শুদ্ধ সত্তা'কে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, বস্তুতঃ শুদ্ধ বৌদ্ধিক পদ দ্বারাও এই শুদ্ধ সত্তা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। এটি অনির্বচনীয়, অসীম, দেশকালাতীত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বয়ংপূর্ণ অস্তিত্ব। একে কোন এক পরিমাণ অথবা পরিমাণসমূহের যোগফল যেমন বলা যায় না, তেমনি কোন এক গুণ অথবা গুণসকলের যোগফলও বলা যায় না। একে কোন আকৃতি অথবা আকৃতির আধারের যোগফলও বলা যায় না। যদি সমস্ত পরিমাণ, গুণ এবং আকৃতি অদৃশ্যও হয়ে যায় তবু এই শুদ্ধ সত্তা থেকে যাবে।

প্রথম দৃষ্টিতে জগৎকে চঞ্চল অস্থায়ী বলেই মনে হয়, যা স্থির শান্ত তাও চঞ্চল বা বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি মাত্র। কিন্তু স্থিরভাবে বিবেচনা করলে শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা আমাদের উপলব্ধি হবে যে অনন্ত গতির পশ্চাতে অনন্ত শান্ত বিদ্যমান। শক্তি এক সত্তারই ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়া বললেই নিষ্ক্রিয়তার বোধ হয়। সত্তা হল শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থা, সত্তাই সকল ক্রিয়ার ভিত্তি।

এই শাশ্বত শান্ত সত্তাকে যে আমরা শুধু উপলব্ধি করতে পারি তা নয়, আমরা এর মধ্যে অবস্থান করতেও পারি। সুতরাং শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে যা সত্য বলে মনে হয়, উপলব্ধির দ্বারা তার সত্যতা আরও দৃঢ় হয়। এটাই শুদ্ধ, শাশ্বত, অনির্বচনীয় ও অনন্ত সত্তা, এটি দেশ-কাল, রূপ, গুণের অতীত, স্বয়ম্ভু, নিরপেক্ষ আত্মা। এই শুদ্ধ সত্তা মানসিক প্রত্যয় মাত্র নয়—বাস্তব সত্য, এটাই মূল সত্য। কিন্তু গতিও সত্য, গতি অলীক নয়।

সুতরাং আমরা দুটি মূল সত্য পাই - সত্তা ও গতি। যেমন তিনি এক এবং বহু, এ সবের উর্দ্ধে, তেমন তিনি সত্তা, গতি এবং এ দুয়ের উর্দ্ধে। কিন্তু তাঁর এই অনির্বচনীয় অবস্থার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বলে আমাদের বলতে হয় যে তিনি সত্তা ও গতি উভয়ই। তিনিই শিব ও কালী, তিনি দেশ কালাতীত শুদ্ধ সত্তা, আবার তিনিই অনন্ত দেশকালের মধ্যে অনন্ত শক্তির ক্রিয়া।

খ) চিৎ - শক্তি(Consciousness - force):

শ্রীঅরবিন্দের চিৎ-শক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি মূল প্রশ্ন দেখা দেয়—এক : 'শুদ্ধ সত্তা'র সঙ্গে 'গতি'র সম্বন্ধ কেমন? এবং দুই : এই গতির প্রকৃতি কেমন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সত্তা ও গতি - একই সত্যের দুই দিক মাত্র। সত্তা ও গতি

Scanned by CamScanner

অভিন্ন, সত্তার মধ্যেই গতি নিহিত, আবার গতির ভিত্তিই হল সত্তা। যেমন শিব ও কালী, ব্রহ্ম ও শক্তি একই, বিচ্ছিন্ন দুই শক্তি নয়। শক্তি 'স্থির' হয়েও থাকতে পারে, আবার 'চঞ্চল'ও হতে পারে। 'শক্তি' এমন কিছু নয় - যা সত্তায় পূর্বে ছিল না, বাইরে থেকে এসেছে। সত্তার মধ্যে শক্তি আত্মকেন্দ্রীভূত হয়ে স্থির থাকতে পারে, আবার আত্মপ্রকাশের ধারায় বিচ্ছুরিত হতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন শক্তি আত্মসমাহিত অবস্থা থেকে প্রকাশের ধারায় ক্রিয়াশীল হয়? কেন শক্তি চিরদিন আত্মসমাহিত রূপেই অবস্থান করে না? যদি সত্তাকে অচেতন বলা হয়, তাহলে এই প্রশ্ন অবাস্তব। কিন্তু সত্তা চিন্ময় হলে প্রশ্নটি যথোচিত আলোচনা যোগ্য। কেননা যদি বলা হয় যে, শক্তি বাইরে থেকে পুরুষকে প্রকাশে বাধ্য করে, তাহলে যখন পুরুষ শক্তির অধীন হয়ে পড়ে, তখন 'পুরুষ' আর নিরপেক্ষ থাকে না, সেক্ষেত্রে 'পুরুষ' ও 'শক্তি'তে বিচ্ছেদ আসে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, যে 'সত্তা' ও 'শক্তি' এক ও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং আমাদের জানা প্রয়োজন 'চিৎ' এর প্রকৃত অর্থ কি?

'চেতনা' বলতে আমরা সাধারণতঃ মানুষের জাগ্রত চেতনাকে শুধু বুঝি। নিদ্রা বা মূর্চ্ছার অবস্থাকে বাদ দিই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে চেতনা এত সংকীর্ণ নয়। নিদ্রিত ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় আমাদের চেতনা যে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। জাগ্রত চেতনা আমাদের চেতনার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এর পশ্চাতে আছে আমাদের সমগ্র মগ্ন-চেতনা ও অবচেতনা - এগুলিই মানবসত্তার অধিক অংশ।

এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যাকে আমরা জড় বা নিশ্চেতন বলি, সেখানেও চেতনা সুপ্তভাবে বর্তমান। যেমন মানুষকে নিদ্রিত অবস্থাতেও চিৎ সম্পন্ন বলা হয়। এই 'চিৎ'ই জগৎস্রষ্টা। চিৎ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, চিৎ সকল কিছুর আধার ও কারণ। যে মহতী চিৎশক্তি সর্বত্র ক্রিয়াশীল, মানবচেতনা তারই একাংশ মাত্র। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী - সকল কিছুতেই চিৎশক্তি বর্তমান ও সক্রিয়। উপস্থিত মানবমন এর পূর্ণতর বিকাশমাত্র। কিন্তু এই মানবচেতনারও উর্দ্ধে এর বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ এতো জগৎস্রষ্টা পুরুষেরই শক্তি। সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশই এই জগতের লক্ষ্য ও পরিণতি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ গতির প্রকৃতিটি কেমন? এমন প্রশ্ন ও গুরুত্বপূর্ণ। এই 'গতি' কি অচেতন শক্তি? কিম্বা বুদ্ধিহীন শক্তি? একে কি রাসায়নিক (Chemical) গতি বলা যায় অথবা এটি সচেতন শক্তি? শ্রী অরবিন্দ বিনা দ্বিধায় বলেছেন, এই গতি সচেতন গতি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে গতি যে সচেতন সে কথা প্রমাণ করেছেন, আবার একথাও বলেছেন ঐ চেতনাই গতি।

তাঁর মতে, এই সচেতন-গতিই চিৎ শক্তি যা সমস্ত সৃষ্টির মূল। এঁকে তিনি 'মা' বলেছেন এবং এই ঐশ্বরিক শক্তিই জগতের সৃষ্টি এবং ধাত্রী সমস্ত কিছুর মূল। এভাবে জগতের সৃষ্টিশক্তি রূপে একটি চেতনশক্তিকে স্বীকার করে শ্রীঅরবিন্দ জগৎ সম্পর্কে 'অচেতন উদ্দেশ্যবাদ' (Unconscious Teleology) এর তত্ত্বকে অস্বীকার করতে সমর্থ হয়েছেন। যে মুহূর্তে তিনি সৃষ্টিশীল শক্তিকে চেতন বলে উপলব্ধি করছেন, তখন আর এই জগৎ-এর উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, নিয়মকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকে না।

গ) অসীম সত্তার আনন্দ (The Delight of Existence,Bliss):

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে অসীম সত্তা শুধুই সৎ এবং চিৎ নয়, তাকে 'আনন্দ'ও বলা যায়। বেদান্তের উপলব্ধি এই যে ব্রহ্ম শুধু চিন্ময়সত্তা নন, তিনি আনন্দঘনও। এক চিন্ময় শুদ্ধ সত্তা

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ হয়, তবে প্রশ্ন হতে পারে, এই অনন্ত নিরপেক্ষ পূর্ণ ব্রহ্মের কোন অভাব বা প্রয়োজন নেই। কোন কিছুর জন্য কামনা নেই, তবে কেন তাঁর চিৎশক্তি বহুরূপে প্রকাশিত হল? যদি উত্তরে বলা হয়—বহুরূপে প্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্টিই তাঁর স্বভাব, তাহলে উত্তরটি সঠিক হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয়, ব্রহ্ম স্বাধীন নন-আপন স্বভাবের অধীন, তিনি নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না। প্রকাশিত না হবার শক্তি তাঁর নেই। এও এক প্রকার অপূর্ণতা, সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।

তাই শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, 'আনন্দ'কেই সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলা যায়। এই আনন্দ থেকেই এই জগতের জন্ম। এক্ষেত্রে প্রাচীন বেদান্তের সৃষ্টির ব্যাখ্যাকে শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি এই সৃষ্টিকে শিবের পরম আনন্দদায়ক নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, নৃত্যের আনন্দই যেমন নৃত্যের উদ্দেশ্য, তেমনি এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যও কেবল আনন্দই। এই আনন্দ আত্মপূর্ণতারই নামান্তর। সুতরাং সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ - সৎ, চিৎ ও আনন্দের আধার সচ্চিদানন্দ।

স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে 'অমঙ্গল' (Evil) প্রসঙ্গে। যদি এই জগৎ ব্রহ্মের আনন্দেরই প্রকাশ হয়, যদি ব্রহ্ম সৎ,চিৎ ও আনন্দেরই সমাহার হন, তবে এই জগৎ-এ 'দুঃখ' ও 'অমঙ্গল' রয়েছে কেন? জগতে এই দুঃখ ও অমঙ্গলের উপস্থিতি প্রমাণ করে, হয় ব্রহ্ম এই দুঃখ ও অমঙ্গলকে রোধ করতে অক্ষম, না হলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলিকে জগতে রেখেছেন। যদি ব্রহ্ম দুঃখ ও অমঙ্গলকে রোধ করতে অক্ষম হন তবে তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নন, আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি মানব জীবনে দুঃখ ও অমঙ্গল দিয়ে থাকেন তবে তিনি 'মঙ্গলময়' নন।

শ্রীঅরবিন্দ অমঙ্গল ও দুঃখের উপস্থিতির প্রসঙ্গে এ জাতীয় যৌক্তিক প্রশ্ন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, ব্রহ্মকে জগতের বাইরে ভাবার জন্যই এ জাতীয় যুক্তি আমাদের মনে আসে। তিনিই সব কিছু। তিনিই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন। সুতরাং, তিনি জীবকে কষ্টের মধ্যে কেন ফেললেন? এ প্রশ্ন ঠিক নয়। কেন তিনি সচ্চিদানন্দ হয়ে নিজেকে নিরানন্দের মধ্যে ফেললেন, কিভাবে তাঁর মধ্যে দুঃখ, কষ্ট, অন্যায়, অশুভ এল - এটাই মূল প্রশ্ন।

শ্রী অরবিন্দের মতে, নীতিধর্ম মনুষ্য সৃষ্ট। জড়জগতে বা নিম্ন প্রাণীর মধ্যে নীতির বালাই নেই। ঝড় বা আগুন যে ক্ষতি করে, প্রাণী প্রাণীকে যে বধ করে, তার জন্য ঝড়, আগুন, বাঘ-সিংহকে কেউ নিন্দা করে না। মানব সমাজের উচ্চস্তরে ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বোধ আসে। মানুষ আনন্দের জন্য আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রসার চায়। তাতে বাধা এলেই সে এই বাধাকে অন্যায়, অশুভ মনে করে। আর যা তার আত্মপূর্ণতার সহায়-তাকেই সে 'ন্যায়সম্মত' ও 'শুভ' বলে। তবে মানবভেদে আত্মপ্রকাশের অর্থেরও ভেদ হয়। একজনের কাছে যা আত্মপ্রকাশ, অন্যের কাছে তা বিপরীত হতে পারে।

সুতরাং অর্থের তারতম্যের জন্য কোনটি একজনের কাছে ন্যায়সম্মত হলেও অন্যজনের কাছে তা অন্যায়। সাধারণ মানুষের কাছে যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা পাপ না হলেও, হত্যাবিরোধী ন্যায় নিষ্ঠের কাছে তা অত্যন্ত অন্যায়। তাই ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম বোধ অত্যন্ত আপেক্ষিক। মানবস্তরে যে ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, আরও উচ্চস্তরে উঠলে সে বোধ আর থাকে না। যেমন মানব চেতনার নিম্নস্তরে নীতির প্রশ্ন নেই। সেইরকম বর্তমান মানব চেতনার উর্দ্ধস্তরেও নীতির

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন থাকবে না। সেখানে বাধাবিঘ্ন এসব থাকবে না। সকলই আনন্দের অভিব্যক্তি। সুতরাং ন্যায়-অন্যায়ও থাকবে না। কিন্তু এই আনন্দ মানব অভিজ্ঞতার সুখ নয়। যেমন চিৎ বলতে শুধু মানব চেতনা বোঝায় না, সেইরকম আনন্দের অর্থ মানবীয় সুখ বোধের থেকেও ব্যাপক। এই আনন্দ কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। এ সার্বিক, অসীম ও স্বয়ংস্থ। জড়, প্রাণ ও মনের মধ্য দিয়ে আনন্দের অভিব্যক্তি হচ্ছে। মানব চেতনাতে এই অভিব্যক্তি আংশিক মাত্র, কামনা বাসনা দুষ্ট ও বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। দিব্য চিৎশক্তির প্রভাবে অহমাত্মক কামনা বাসনা দূর হলেই পূর্ণ দিব্য আনন্দের আবির্ভাব হবে। সত্য সুখের পরিবর্তে আসবে অমৃতময় আনন্দ।

Scanned by CamScanner